SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

মেঘনাদবধ-মহাকাব্যে রস-বৈষম্য

Avijit Pandit
Assistant Professor
Dept. of Sanskrit, Belda College
Belda, Paschim Medinipur, West Bengal, India.
Email ID: avijitpanditsanskrit09@gmail.com

Abstract: বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক-ইতিহাসের একটি অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ হল 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের' অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য। 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে উনিশ-শতকীয় নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় রামায়ণ কাহিনীকে নতুন করে রূপ দিয়েছেন। সংস্কৃত-অলংকারশাস্ত্রানুসারে কাব্যে প্রধান বা মুখ্যরস হবে একটি, যা হল অঙ্গীরস। ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যান্য রস সমূহ, মুখ্যরস বা অঙ্গীরসের অঙ্গরূপে উপস্থিত হয়। 'কিরাতার্জুনীয়ম্', 'শিশুপালবধম্' ইত্যাদি বীররসাশ্রিত মহাকাব্যসমূহে করুণ রসের আধিক্য দেখাযায় না বা অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তা হওয়ার ও কথা নয়; যদিও বা 'উত্তররামচরিতম্' নামক করুণরসাশ্রিত মহাকাব্যে বীররসই পরিপূরক। বীররসের প্রয়োজন তখনই হয়, কোথাও যদি কাহিনীর নায়ক, নায়িকা বা মুখ্যচরিত্র কারুণ্য বা শোকের আবহে মূহ্যমান হয়েযায় বা যখন শৃঙ্গারাদি অন্যান্য রসসমূহ কোনভাবেই মুখ্যচরিত্রকে কারুণ্যের আবহথেকে মুক্ত করতে পারে না। মেঘনাদবধ মহাকাব্যের প্রারম্ভে করুন রসের সূত্রপাত কিন্তু তার পরিপূরক রূপে প্রথমে বীর রসের উন্মেষ ঘটে, অতঃপর করুণ রস ও বীর রস কাছাকাছি থেকে প্রবাহিত হয় সারাকাব্য জুড়ে, সর্বশেষে পুনরায় কাব্যের সমাপ্তি ঘটে করুণ রসের মাধ্যমে। তাই সাধারণ বিচারে এই কাব্য করুণ রসের মহাকাব্য হিসেবে পরিগণিত হয়, সহৃদয়-পাঠকের মতে এ এক করুণ রসের মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকার 'যোগীন্দ্রনাথ বসু'ও এ সম্পর্কে বলেছেন— "মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য।" বিয়োগান্তক কাব্য বা নাটক যে করুণ রসাশ্রিত হয় তা বলাই বাহুল্য, সে দিক থেকে অলংকারশাস্ত্রের অনুশাসন মেনেই মেঘনাদবধ মহাকাব্য করুণ রসের ধারায় সিক্ত হয়েছে। কিন্তু মেঘনাদবধ মহাকাব্যের প্রস্তাবনায় কবি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীদেবীর নিকট যে প্রার্থনা করেছেন— "গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত"।[১] –এই উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে বীররসাশ্রিত কাব্য রচনাই কবির অভিপ্রেত ছিল। কাব্যের মুখ্যবিষয় যুদ্ধ-সংঘাত-ঘাতপ্রতিঘাত, তা কেবলমাত্র বীর রসেরই স্থায়ীভাব সৃষ্টি করে। এখন এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে— নায়কের করুণ পরিণতি কবির কি প্রথমে অনভিপ্রেত ছিল! না কি কবি লিখতে চেয়েছিলেন অন্য কোনও রসাশ্রিত কাব্য! না কি বীর-রস করুণ-রসের অবলম্বন ব্যতীত অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলেই কি কাব্যের এই বিষম-পরিণতি! কিন্তু মহাকাব্যে 'মেঘনাদ' চরিত্রটি বীরত্বের প্রতীক তথা বীর রসের প্রতীক, অপরদিকে 'বধ' কারুণ্যের তথা করুণ রসের প্রতীক। কাব্যে কোন রসের প্রাধান্য প্রকাশিত হয়েছে তা সহৃদয়-পাঠকের বিচারাধীন কিন্তু কবির মানসপটে যে মুখ্যতঃ মেঘনাদ-চরিত্রটি বিচরণ করেছেন তার প্রমাণ কাব্যের প্রস্তাবনায় উক্ত রস-নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। কাব্যে রসনির্মাণ হল

চরিত্রনির্ভর, ঘটনানির্ভর নয়। 'বধ' এখানে ঘটনামাত্র, কোনও চরিত্র নয়। 'মেঘনাদ', 'লক্ষ্মণ', 'রাবণ' প্রভৃতি বীরেরা কাব্যের চরিত্র —তাই 'বীর' রসই এই কাব্যের মুখ্যরস; কবি-প্রতিভাকে সমর্থন করেই অলংকারশাস্ত্রের দৃষ্টিতে কাব্যে উপস্থিত বিবিধ-রস-বৈষম্য অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এই শৌধপত্রে।

Keywords: সংস্কৃত-অলংকারশাস্ত্র, রস, স্থায়ীভাব, করুণ-রস, বীর-রস, চরিত্র, ঘটনা।

'রস' শব্দটি এখানে 'নান্দনিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উপনিষদ্ অনুসারে বিশ্ব হল সৃষ্টি, আর স্রষ্টা হলেন ব্রহ্ম। বিশ্বসৃষ্টির একটি উদ্দেশ্যের কথাও উপনিষদে বলা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যকারণ হল রসের আস্বাদন। এই রসাস্বাদন যেন অহৈতুকী আনন্দ, এক শিল্পতাত্ত্বিক অনুভুতি, ব্রহ্মের আনন্দময়সত্তার প্রকাশ। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, জীব এই রসকে লাভকরেই আনন্দিত হয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রস ব্যতীত কোনকিছুই সম্ভব নয়— 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'।[২] ভরতাচার্যের প্রাচীনতমগ্রন্থেই সর্বপ্রথম রস সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল— 'রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ'।[৩] উত্তরে ভরতাচার্য বললেন— 'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'।[৪] আরও বলেছেন রস ব্যতীত কোনও অর্থই প্রবৃত্তি হতে পারে না— 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থ প্রবর্ততে'।[৫] সংস্কৃত-অলংকারশাস্ত্রানুসারে কাব্যের মূলসূত্র 'বিশ্বনাথ কবিরাজে'র কথায়—

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তাঃ গুণালঙ্কার-রীতয়ঃ"॥[৬]

রসযুক্তবাক্য বা কাব্যের আত্মা হল রস, কাব্যে রসই প্রধান। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, জীব এই রসকে লাভকরেই আনন্দিত হয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রস ব্যতীত কোনকিছুই যে সম্ভব নয়, বিজ্ঞানে রস খুঁজে না পেলে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় কি? আমরা দেখবো 'মেঘনাদবধ'কাব্যে কমবেশি সমস্ত প্রকার রসই প্রকাশিত হয়েছে। মহাকবি 'ভবভূতি' তাঁর 'উত্তররামচরিতম্' মহাকাব্যে বলেছেন–

"একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা-
দ্ভিন্নঃ পৃথক্-পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্"॥[৭]

ভবভূতির এই বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে 'মেঘনাদবধ'কাব্যে। 'মেঘনাদবধ'কাব্যে বিভিন্ন রস প্রকাশিত হলেও কেবলমাত্র বীররস ও করুণরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু কাব্যে প্রধান রস কি কি হতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আচার্য-ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রম্' গ্রন্থে, সেই নির্দেশানুসারে করুণ রস কখনোই কাব্যের প্রধান বা অঙ্গীরস হতেপারেনা। ভরতাচার্য আট প্রকার রস এবং স্থায়ীভাবের কথা বলেছেন—

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥[৮]
রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ"॥[৯]

ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রম্' গ্রন্থে রসের লক্ষণ করেছেন– 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিস্পত্তিঃ'।[১০] ভরতাচার্য আটটি রস স্বীকার করেছেন, পরবর্তীকালে আচার্য 'অভিনবগুপ্ত' 'শান্ত' নামক নবম রসকে স্বীকার করেছেন যার

'নির্বেদ'। আচার্য 'মম্মট' প্রভৃতি আলংকারিকদের দ্বারা ও নবরস স্বীকৃত হয়েছে—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতি ভারতী কবের্জয়তি"॥[১১]

আরো পরবর্তী কালের আলংকারিকগণ যেমন কবিরাজ'বিশ্বনাথ' প্রভৃতি 'বাৎসল্য' রসের কথা বলেছেন কিন্তু সমালোচকগণ 'শৃঙ্গারপ্রভৃতি শান্তপর্যন্তম্' —এই নবরসকেই সর্বাদিসম্মত রূপে গ্রহণ করেছেন। ভরতাচার্য আটটি রসের মধ্যে চারটি রসকে প্রধান বলেছেন— শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। শৃঙ্গার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত এবং বীভৎস থেকে ভয়ানক রস উদ্ভুত হয়—

"শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাত্তু করুণো রসাঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ"॥[১২]

প্রথম চারটি রস কাব্যে প্রধান বা অঙ্গীরস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, পরবর্তী চারটি রস প্রধান রসের অঙ্গরস রূপে বা অপ্রধান রস রূপে কাব্যে ব্যবহৃত হবে। 'অগ্নিপুরাণ' অনুসারে 'রাগ-তৈক্ষ্ণ্য-অবষ্টম্ভ-সংকোচ' —এই রাগাদি চতুষ্টয় থেকে যথাক্রমে 'শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস' রসের উদ্ভব হয়। 'ধনঞ্জয়' তাঁর 'দশরূপকম্' গ্রন্থে 'শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস ও রৌদ্র' —এই চারটি রসকেই স্বীকার করেছেন। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে অলংকারশাস্ত্রের কোনও গ্রন্থে করুণ রসকে প্রধান বা অঙ্গীরস হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। তাই শ্রী মধুসূদন অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম মেনেই কাব্যের প্রারম্ভে বীর-রসাশ্রয়ী কাব্য রচনার কথা বলেছেন— "গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত"।

'মেঘনাদবধ'মহাকাব্যে বিভিন্ন রস প্রকাশিত হলেও কেবলমাত্র বীররস ও করুণরসেরই প্রাধান্য লাভ করেছে, বিশেষতঃ আমারা বীররস ও করুণরসের আলোচনার মধ্যদিয়ে অন্যান্য গৌনরসের অধিকার ও অন্বেষণ করার চেষ্টা করব। বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ বা উৎসাহ থেকেই বীররসের উৎপত্তি, কাব্যের বিষয় লঙ্কা যুদ্ধ এবং তার উদ্যোগায়োজন যার প্রধান কারণ উৎসাহ। রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ যে কাব্যে যোদ্ধা-বীরপুরুষ এমনকি যুবরাজ-মহিষী প্রমীলা ও তাঁর চেড়ীগণ যে কাব্যে বীর-রমণী রূপে বর্ণিত, সে কাব্যে তো বীররসের প্রাধান্য থাকবেই। তাই কবি স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলেছেন- "গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত"। কাব্যারম্ভে ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বগাথা শ্রবণের পর শোকার্ত রাবণের হৃদয় বীরোচিত উৎসাহে পূর্ণ হয়—

"সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কার ফনী
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী! চল, সবে,—"[১৩]

রামবংশের সাথে যুদ্ধে লঙ্কার প্রায় সকল যোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন, বীর ছাড়া লঙ্কা মহাসমস্যায় পড়েছিল, সেই কারণেই রাবণ অসুর বংশের মর্যাদা বজায় রাক্ষার জন্য যা বলেছিলেন তাতে বীররস প্রকাশিত হয়েছে—

"বীরশূন্য লঙ্কা মম। কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।

সাজ, হে বীরেন্দ্র-বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ।"[১৪]

শুধুমাত্র বীর নয়, বীরাঙ্গনা নারীর কণ্ঠেও উৎসাহ পূর্ণ বীর রসের প্রকাশ আমারা দেখতে পাই যখন পতি মেঘনাদের অনুসন্ধানে প্রমীলা লঙ্কাপুরে যেতে চাইলে, সখীগণ রাঘবসেনা থাকায় তার যাত্রাপথে আশঙ্কার কথা বলেন। এই আশঙ্কাকে দূর করে প্রমীলার উৎসাহব্যঞ্জক উক্তি—

"দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃ কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?" [১৫]

রাঘবকূলেও আমরা বীররসের প্রকাশ দেখি। মেঘনাদের বধের কারণে গোটা স্বর্ণলঙ্কা যখন শোকাহত, তখন ক্রোধান্বিত লঙ্কারাজ রাবণ চতুরঙ্গ সহযোগে যুদ্ধে রাঘবকুলকে আহ্বান করেন, এই বিশাল রাক্ষস বাহিনীর কাছে রাঘবকুলের সেনাবাহিনী সত্যই তুচ্ছ, তাই এই কাল সমরে লক্ষণকে যেতে নিষেধ করাহলে রাবণের প্রতি ভ্রাতা লক্ষণের উক্তিতে বীররস প্রকাশিত হয়—

"ক্ষত্রকূলে জন্ম মম, রক্ষঃকুল পতি,
নাহি ডরি যমে আমি: কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্যকর, রথি, আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।"[১৬]

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ প্রথমে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন ঠিকই, কিন্তু বীরভদ্র যখন রুদ্রতেজ সঞ্চারিত করে তাঁর সম্বিত্ ফিরিয়ে আনলেন তখন থেকেই ধীরোদাত্ত নায়কোচিত মূর্তিতে তিনি মহাকাব্যের প্রকৃত নায়ক হয়ে উঠলেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় ভাবে গুপ্তহত্যার বিবরণ শোনা মাত্র রামানুজ লক্ষ্মণের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বীররস প্রকাশিত হয়েছে—

সরোষে— তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে![১৭]

এছাড়াও রাঘবকুলের সমুদ্রবন্ধন, বালীবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বে বিশল্যকরণী লতার আনয়নে, সর্বোপরি পুনরায় লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে গমনে এতো বীরভাবের পরিচায়ক। যদিও রাঘবকুলের সহায়করূপে দেব-দেবী ছিলেন, কিন্তু দেব-দেবী যে কুলের ভয়ে সন্ত্রস্ত, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ তো সত্যই বীরত্বের পরিচায়ক। এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক যুদ্দোদ্যোগ বর্ণনা কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান-পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গের অনেকস্থলেই বর্ণনায় ও বাক্যে বীর রস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। কব্যখানিমূলত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বীররসাত্মক স্বয়ং কবি মধুসুদন এই অঙ্গীকার করলেও এর নানাস্থলে করুণ রসের অতিসুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাই, বিশেষত; শেষ সর্গে করুণ রস যেন মূর্তিমান হয়ে

পাঠককে অভিভূত করে তোলে।

শোক থেকেই 'করুণ' রসের উৎপত্তি, একাব্যে বীর রসের পরেই করুণ রসের প্রাধান্য এবং করুণ রসের অভিব্যক্তি সত্যিই অতুলনীয়, কাব্যের শুরুতেই মূর্ত্তিমান করুণরস—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুল পতি,
বাক্য-হীন পুত্র-শোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা-তিতিয়া বসনে,[১৮]

অষ্টম সর্গে রাবণের শক্তিশেলে নক্ষ্মণের পতনে রামচন্দ্রের বিলাপ করুণ রস সৃষ্টি করে—

রণক্ষেত্রে! ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রী বৈদেহীনাথ ভূপতি ও
নীরবে। নয়নজল অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে।[১৯]

লঙ্কার রণক্ষেত্র বর্ণনা, সভাস্থলে বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন, অষ্টম সর্গে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করে রামের ক্রন্দন এবং সর্বশেষে নবম সর্গে মৃত মেঘনাদের সামরিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনা ও প্রমীলার সহমরণ —এইসব স্থলে করুণরস সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পুত্রশোকাতুর রাবণ বীর নায়কের বেশ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসির বেশ ধারণ করেছেন—

বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।[২০]

চিতারোহণ কালে প্রমীলার মুখে—

"-লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলাস্থলে"।[২১]

এবং তারপরে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতা সমক্ষে "বিশাদ বস্ত্র" ও "বিশদ উত্তরী" রাবণের মুখে—

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;[২২]

পিতৃহৃদয়ের অনুতাপ, অসহায় পিতার দীর্ঘশ্বাস আর বিলাপের মধ্যেই মহাকাব্যের সমাপ্তি। ফলে, যে করুণ রসে কাব্যের সূচনা সেই কারুণ্যের ধারাতেই কাব্যের সমাপন পাঠকচিত্তকে আকুলিত করে। মহাকাব্যের সমাপ্তিতে মেঘনাদের শবদাহের পরাবস্থাতে করুণ রসের প্রকাশ অত্যন্ত বেদনাময়—

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।[২৩]

বীর ও করুণ —এ দুটি অঙ্গীরস ছাড়াও আমরা অন্যান্য রসের প্রকাশ দেখতে পাই, যেমন শৃঙ্গারসের প্রকাশ আমরা মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্যলীলায় দেখি, তাছাড়া কিছুটা প্রকাশিত হয় প্রেতপুরীতে কামাতুর প্রেত-প্রেতিনীর আচার-আচরণে। এছাড়া ভয়ানক ও

বীভৎস রস উভয়ই আমাদের একসঙ্গে প্রেতপুরী ও নরকবর্ণনা অংশে একসঙ্গে ধরা পড়ে। হাস্য রসের প্রকাশও গৌণ হলেও লক্ষ করা যায় প্রমীলা বাহিনীর হনুমানের প্রতি কথোপকথনে এবং সুগ্রীবের প্রতি রাবণের কথনে। অদ্ভুতরস ও পরিলক্ষিত হয়, যুদ্ধাদির ব্যাপার নিয়ে যে কাব্যের বর্ণনা সে কাব্যে যদি প্রেতপুরীর বর্ণনা থাকে সেখানে তো অদ্ভুত রসের প্রকাশ ঘটবেই, প্রথম সর্গে বিস্ময় ও ভয়ে ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনি বর্ণনা, তৃতীয় সর্গে বীরবেশধারী প্রমীলাকে দেখে হনুমানের বিস্ময়ভাবাত্মক উক্তি এবং নৃমুণ্ডমালিনীকে বিদায় দিয়ে বিভীষণের কাছে রামের উক্তিতে অদ্ভুত রসের প্রকাশ পাই। রৌদ্ররস যা ক্রোধ থেকে জাত, রৌদ্ররসের প্রকাশ বহুস্থলে লক্ষ করি, যেমন বাসন্তী প্রমীলাকে লঙ্কায় যেতে বারণ করায় প্রমীলার উক্তিতে। আবার এছাড়া মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ছদ্মবেশী অগ্নিদেব বলে ভ্রম হলে, দাশরথির রুষ্ট বচন। তাছাড়া রাক্ষস সৈন্যদিগের প্রতি মেঘনাদ বধের প্রতিবিধানে উদ্যোগী রাবণের ক্রোধান্বিত অভিভাষণ—

"দেব দৈত্য নর-রণে যার পরাক্রমে,
জয়ী রক্ষঃ অনীকিনি"[২৪]

শান্তরসের স্থায়ীভাব শান্তি বা নির্ব্বেদ, শান্তরসের অভিব্যক্তি ঘটেছে বীরবাহুর শোকে রাবণের উক্তিতে তথা সীতার মুখে পঞ্চবটী বাস বর্ণনায়, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে রাবণের খ্যাতি দেখে লক্ষ্মণের দ্বারা ঐশ্বর্যমহিমা জ্ঞাপিত হলে বিভীষণের উক্তিতে শান্তরসের প্রকাশ ঘটেছে। উপরিউক্ত নয় প্রকার রস ছাড়াও সংস্কৃত আলংকারিকগণ বাৎসল্যকেও একপ্রকার রস বলে স্বীকার করেছেন, স্নেহ থেকে যার উৎপত্তি। সংসারের যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্যে যাঁহাদের কাছে করজোড়ে কল্যাণ প্রার্থনা করতে হয়, সেই সর্বকল্যাণময়ী লোকমাতৃকাগণ ভিন্ন বাৎসল্যরসের দেবতা আর কে হতে পারে? মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরীর স্নেহ, বীরবাহুর প্রতি চিত্রাঙ্গদার স্নেহ। তাছাড়া রামের ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতি বর্ননায় বাৎসল্যরসের প্রকাশ ঘটেছে, যেমন মেঘনাদের প্রতি রাবণের উক্তিতে—

এ কাল সমরে
নাহি হে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার।[২৫]

মেঘনাদবধ-মহাকাব্যে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নবরস তথা বাৎসল্য রসের সমাহার ঘটলেও বিশেষকরে বীর ও করুণ রসের প্রকাশ প্রকটিত হয়েছে, কাব্যে কোন রসের প্রাধান্য আছে এ নিয়ে বিতর্ক আছে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকার 'যোগীন্দ্রনাথ বসু'ও এ সম্পর্কে বলেছেন— "মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য।" একটু গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করলে মেঘনাদবধ-মহাকাব্যের রস-বিচার সম্পর্কে বলাযায় যে- বীররস এই কাব্যের আভরণ মাত্র কিন্তু কাব্যদেহখানি করুণ রসেই অভিসিঞ্চিত। কাব্যের প্রতিসর্গেই বীর-রসের স্পর্শ রয়েছে, অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম মেনেই একটি করুণরসাত্মক পরিস্থিতির পরেই বীরত্বব্যঞ্জক তেজোদ্দীপক বাক্যাবলীর ব্যবহার সমন্বয়সাধন করেছে, কিন্তু তথাপি কোথাও যেন পাঠকচিত্তে রাবণ, মন্দোদরী, প্রমীলা, এমন কি রাম, সীতার কাতর বিলাপও করুণ রসোৎপত্তি ঘটায়। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে এরজন্য কবি ততটা দায়ী নন, বরং পাঠকের কোমল-দুর্বল-চিত্তবৃত্তিই দায়ী। অলংকারশাস্ত্রের দৃষ্টিতে উপস্থিত বিবিধ-রস-বৈষম্যর আলোকে মানসিক দ্বন্দ্বের দোলাচলে 'মেঘনাদবধ-মহাকাব্য' পাঠকচিত্তে অত্যন্ত উপভোগ্য।

Endnotes

১. মেঘনাদবধ - প্রথম সর্গ।
২. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (২।৭।২)।
৩. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
৪. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
৫. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
৬. সাহিত্য দর্পণ (প্রথম পরিচ্ছেদ।৩)।
৭. উত্তররামচরিতম্ (৩/৪৭)।
৮. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়/১৫)।
৯. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়/১৭)।
১০. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
১১. কাব্যপ্রকাশ (১ম উল্লাস/১)।
১২. ভরত-নাট্যশাস্ত্রম্ (ষষ্ঠ অধ্যায়/৩৯)।
১৩. মেঘনাদবধ - প্রথম সর্গ।
১৪. মেঘনাদবধ - প্রথম সর্গ।
১৫. মেঘনাদবধ - তৃতীয় সর্গ।
১৬. মেঘনাদবধ - প্রথম সর্গ।
১৭. মেঘনাদবধ – সপ্তম সর্গ।
১৮. মেঘনাদবধ – প্রথম সর্গ।
১৯. মেঘনাদবধ – অষ্টম সর্গ।
২০. মেঘনাদবধ – নবম সর্গ।
২১. মেঘনাদবধ – নবম সর্গ।
২২. মেঘনাদবধ – নবম সর্গ।
২৩. মেঘনাদবধ – নবম সর্গ।
২৪. মেঘনাদবধ – সপ্তম সর্গ।
২৫. মেঘনাদবধ – প্রথম সর্গ।

Bibliography

- সেন অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভুষণ সীতানাথ, ঘোষ মহেষচন্দ্র, উপনিষদ্ অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭২।
- বন্দোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, ভরত নাট্যশাস্ত্র ১, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৯, ১৯৫২।
- বন্দোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র, ভরত নাট্যশাস্ত্র ২, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৯, ১৫ই মার্চ ১৯৫৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড: জয়ন্ত, গিরি, ড: পুষ্পেন্দু শেখর, মেঘনাদবধ কাব্য- বিকল্প পাঠ, দে'জ পাব্লিশিং, কোলকাতা, ২০১৫।
- সান্যাল, দীননাথ, মেঘনাদবধ কাব্য (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), প্রজ্ঞাবিকাশ, কোলকাতা, জানুয়ারী ২০১২।
- শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য (এ. এল, ব্যানার্জি সংস্করণ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৯৮-৯৯।
- রায়, ড: জীবেন্দু, মেঘনাদবধ কাব্য (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), শিলালিপি, কলিকাতা, মার্চ ১৯৯০।
- ব্যানার্জি, এ. এল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্য, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলিকাতা, ১৯৭০।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, দত্ত, ড: মিলন, মেঘনাদবধ কাব্য, সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১২৬৭ সাল।

——